পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

উন্নয়নের সাথে পরিবেশ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সাম্প্রতিক এ উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রয়াসকে এগিয়ে নেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যা এখন একটি অর্থনৈতিক সমস্যাও বটে। একারণেই অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মকান্ডসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে দেখার অবকাশ নেই। পরিবেশগত সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থেই প্রয়োজন একটি সমন্বিত উদ্যোগ (Integrated approach)।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশ

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন পণ্য ও সেবার প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মানবকল্যাণ এবং উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু উৎপন্ন পণ্য এবং সেবার নিরিখে প্রচলিতভাবে নিরূপিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু সম্প্রতি টেকসই উন্নয়নের ধারণা জোরালো হওয়ার পর এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের জীবন ধারণের মান নিরূপণে বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য প্রয়োজন বিকল্প পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অবচয় এবং পরিবেশগত বিষয়াদি যা টেকসই উন্নয়নে প্রভাব ফেলে, বিবেচনায় আনা হয়।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অফিস ১৯৯৩ সালে পরিবেশ বিষয়টি বিবেচনায় এনে System for Environment and Economic Accounts (SEEA) প্রণয়ন করেছে। এতে প্রচলিত জাতীয় আয় নিরূপণের তথ্যের সাথে পরিবেশগত তথ্য ও উপাত্তসমূহের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে Environmentally Adjusted Net Domestic Product (EDP) এবং Environmentally Adjusted Net Income (ENI) নিরূপণ করা হয়। SEEA নির্ণয়ের ক্ষে-ত্র উৎপাদন এবং ভোগের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত সম্পদ যেমন-ভূমি, বনাঞ্চল, পানি, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একইভাবে উৎপাদনের জন্য অন্যান্য অতিরিক্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ব্যয়সমূহ হ'ল- খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাসের হিসাব এবং উৎপাদন ও ভোগের সাথে সম্পৃক্ত ভূমি, পানি, বায়ূ ইত্যাদির অবচয় খরচ।

বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন

বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলনে স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সে (UN Conference on the Human Environment) প্রায় ১১৩টি দেশ, ১৯টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং প্রায় ৪০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। স্টকহোম কনফারেন্স এর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি) কেনিয়ার নাইরোবীত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্যা কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন)।

স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies)/মন্ত্রণালয় গঠিত হয় এবং অনেক দেশেই জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়।

ধরিত্রী সম্মেলন

স্টকহোম কনফারেন্সের ২০ তম বার্ষিকীতে জাতিসংঘ জুন ১৯৯২ সালে রিওডি জেনরিওতে জতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন কনফারেন্স (UN. Conference on Environment and Development-UNCED)-এর আয়োজন করে যা ধরিত্রী সম্মেলন হিসেবে বহুল পরিচিত। এই সম্মেলনে ১৭৮ টি দেশের প্রায় ১০,০০০ প্রতিনিধি এবং বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা যোগদান করে।

রিও সম্মেলনে নিম্নোক্ত ডকুমেন্টস-এর ওপর সমঝোতা হয়ঃ

ক. ২৭ দফা সম্বলিত রিও ঘোষণা;
খ. এজেন্ডা ২১ এবং
গ. বন নীতির বিবৃতি।

এছাড়া, নিম্নোক্ত দু'টি কনভেনশনের বিষয়েও সমঝোতা হয়ঃ

ক. জলবায়ূ পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এবং
খ. জীববৈচিত্র্য কনভেনশন।

সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য UN Commission on Sustainable Development (UNCSD) প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (WSSD)

ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ টেকসই উন্নয়নের বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণের লক্ষ্যে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে জোহানেসবার্গে শুরু হয় World Summit on Sustainable Development (WSSD)। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হ'লঃ

- এজেন্ডা-২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং তা পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নিরূপণ। এছাড়া রিও সম্মেলনের অন্যান্য এগ্রিমেন্টসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও এজেন্ডা-২১ এর কাঠামোর আলোকে রিও সম্মেলনের পর থেকে বেরিয়ে আসা নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ-এ পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়সমূহের মধ্যে সমতা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়নের নীতিসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ।

WSSD সম্মেলনকে এ অর্থে সফল বলা যায় যে, এ সম্মেলনে রিও সম্মেলনের পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কিয়োটো প্রটোকল

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, হিমবাহ গলে যাওয়া ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার জন্য দায়ী ক্ষতিকর কার্বন-ডাই অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকর হয়েছে। বিশ্বের ১৪১টি দেশ ইতোমধ্যে প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে। United Nations Framework Convention on Climate Change-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে কিয়োটা প্রটোকলের নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। কিয়োটা প্রটোকলে শিল্পন্নোত দেশসমূহকে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে ৬টি গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণের মাত্রা ১৯৯০ সালের তুলনায় ৭ শতাংশ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। কিয়োটো প্রটোকল বনায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কারণ বাতাসের কার্বন শোষণ করে এরূপ কার্যক্রম, যেমন বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণ মাত্রা হ্রাসে সহায়তা করে। কিয়োটো প্রটোকলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল Clean Development Mechanism (CDM) যার আওতায় উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমণ হ্রাসের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নির্গমণ হ্রাস করার মাধ্যমে ক্রেডিট নিজের খাতে জমা করতে পারবে।

বাংলাদেশের পরিবেশগত মূল সমস্যাদি

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে খরা ও বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যাদির নির্বিচার প্রয়োগ, অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, কৃষি ও বসতির কারণে বনাঞ্চলে অযাচিত অনুপ্রবেশ এবং ক্ষতিকর শিল্পবর্জ্যের যথেচ্ছ নিক্ষেপণের কারণে ভূমির কার্যকর গুণাবলীর অবক্ষয় ঘটেছে। উপকুলীয় এলাকায় মৃত্তিকায় অবক্ষয় ঘটছে অপরিকল্পিত ভূমিব্যবহার এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে। দেশের ভূউপরিস্থ পানি শিল্প কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, পৌর এলাকার অপরিশোধিত বর্জ্য পানি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, তৈল বাহিত দূষণ এবং নদীবন্দর ও উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রবন্দর ও জাহাজভাঙ্গা কর্মকান্ড থেকে নিঃসৃত তৈল জাতীয় পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত দূষিত হয়ে চলছে। বাংলাদেশে, বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি একটি মারাত্নক জাতীয় সমস্যা। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-মধ্য (কেবল উত্তরাংশ) ও দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলসমূহে যে সকল নলকুপের মাধ্যমে ১০ মিটার থেকে ১০০ মিটার গভীরতা থেকে পানি উত্তেলিত হয় সে সকল নলকুপে এই সমস্যা তীব্র-যা গ্রামীন জনজীবনে সুপেয় পানি প্রাপ্তি বিঘ্নিত করছে।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সীমান্তের অপরপার থেকে প্রবাহিত ৫৭টি নদী রয়েছে। এই ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টির ক্ষেত্রে ভারত ও ৩টির ক্ষেত্রে মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ যৌথ অংশীদার। এসব নদীর উজানে সেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পানি উত্তোলনের কারণে আন্তর্জাতিক সীমারেখার অপরপার হতে আগত নদীসমূহ থেকে পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়েছে। গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ এক্ষেত্রে একটি আলোচিত উদাহরণ। গঙ্গানদীতে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানির উত্তোলনের ফলে বাংলাদেশের কতিপয় অঞ্চলে খরাপরিস্থিতির সূচনা হয়েছে। এছাড়া ভারতের আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বার্ষিক পানি প্রবাহ ব্যপকভাবে হ্রাস পাবে যা দেশের অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশের ওপর অপরিসীম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

সমগ্র পৃথিবীজুড়ে মানবসৃষ্ট যে সকল পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে চলেছে, বায়ূদূষণ সেগুলির একটি। বাংলাদেশে বায়ূদূষণের উৎস দু'টিঃ যানবাহন ও শিল্প কারখানা থেকে নিঃসৃত কালো ধোঁয়া। এ দু'টি উৎস মূলত নগরাঞ্চলে বেশী মাত্রায় বিরাজমান। বায়ূদূষণের অপর উৎস হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশে মূলতঃ শুষ্কঋতুতে পরিচালিত অসংখ্য ইটের ভাটাও রয়েছে। এ সকল ইটের ভাটায় অধিকাংশ জ্বালানী হিসেবে কয়লা ও কাঠ ব্যবহার করা হয় যা থাকে নিঃসরিত হয়ে থাকে সালফার ডাই অক্সাইড ও উদ্বায়ী জৈবযৌগ। বায়ূতে যানবাহন থেকে নিঃসৃত লেড এর উচ্চমাত্রায় উপস্থিতি নগর ও শহরাঞ্চলে একটি উদ্বেগজনক সমস্যা।

মানবসৃষ্ট বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দ্বারা ভূমি, বনাঞ্চল ও জলজ বসতি ধ্বংস ও অবক্ষয়জনিত কারণে জীববৈচিত্র্য নিঃশেষিত হচ্ছে। এ সকল কর্মকান্ড ঘটে চলেছে কৃষিব্যবস্থা, বনাঞ্চল, মাৎস্য সম্পদ, নগরায়ন, শিল্পকারখানা, পরিবহন ব্যবস্থা, পর্যটন, জ্বালানি, রাসায়নিক, খনিজসম্পদ ইত্যাদি সেক্টসমূহে। বিগত দশকে চিংড়িচাষ মাৎস্য সেক্টরে একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ। পরিবেশ ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়া গভীর ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে সমূহক্ষতিগ্রস্ত করেছে মাৎস্য ও অন্যান্য জলজ জীববৈচিত্র্য। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদশের জলবায়ূর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বঙ্গোপসাগর উপকূল বরাবর সমুদ্রস্তর স্ফীতি এবং তারফলে সুন্দরবনসহ দেশের ১০ থেকে ২০ শতাংশ স্থলভাগে স্থায়ী জলমগ্নতা দেখা দিতে পারে ও নদনদীতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশে পরিবেশগত বড় ধরণের বিপর্যয় মোকাবেলা করার মতো প্রযুক্তি বা সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একারণে বড় ধরণের পরিবেশগত বিপর্যয় যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য সরকার দেশের পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হ'লঃ

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন

ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ওপর নির্ভরশীল। ভূমি, পানি সম্পদ ও প্রকৃতিক পরিবেশ দেশজ উৎপাদে বিশেষ অবদান রাখে। একটি নির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে এ তিন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সমন্বয় সাধন তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার জুন ২০০১ সালে 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, বাংলাদেশ' অনুমোদন করেছে। ভূমি অবক্ষয় রোধে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য নীতি ও ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিবেশ নীতি, জাতীয় পরিবেশ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় বন নীতি, কৃষি নীতি এবং কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় পানি নীতি

পানি দূষণ ও পানির দুষ্প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্মরত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তরসমূহ পানি দূষণ ও পানির দুষ্প্রাপ্যতা সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে। দেশের পনি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষত পানি সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ ও পানি সংক্রান্ত সেবাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ ও স্থানীয় সংস্থাসহ বেসরকারি ব্যবহারকারি ও উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সম্বলিত 'জাতীয় পানি নীতি' ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে জারি করা হয়েছে। পানি নীতির মূল উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সবধরনের পানির উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দক্ষ ও সুষম ব্যবস্থাপনা;
- ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি পানি সরবরাহ পদ্ধতির টেকসই উন্নয়ন;
- বিকেন্দ্রীকরণ এবং নারীর ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন;
- বিকেন্দ্রীকরণ এবং বেসরকারি খাতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিকাশের জন্য আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং
- জ্ঞান ও সামর্থ্যের উন্নয়ন।

পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮০ সাল থেকে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন নদ-নদীর বিভিন্ন পয়েন্ট-এ ভূ-উপরিস্থ পানির গুণগতমান সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করে চলছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে ৮০টি কেন্দ্রে পানির গুণগতমান সংক্রান্ত উপাত্ত পরিবীক্ষণ করে চলছে। কোন কোন কেন্দ্র গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট মনিটরিং সিস্টেম (জেমস)-এর আওতাধীন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত। এ সকল কেন্দ্রের পরিবীক্ষণজাত উপাত্ত বাংলাদেশ সরকারের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রদত্ত অঙ্গীকার পরিপূরণের অংশ হিসেবে কেনিয়ার নাইরোবিতে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি)

জাতীয় পানি নীতির আলোকে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু, সমন্বিত এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Water Management Plan) প্রণয়নের কাজ নভেম্বর ২০০১ সালে সমাপ্ত হয়। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩১, মার্চ, ২০০৪ তারিখ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৫ বৎসর মেয়াদি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে-প্রথম ৫ বৎসরের জন্য গৃহীত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনায় চলতি কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করে নতুন কার্যক্রম চিহ্নিত করা হবে।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার পর্যায় শুরু হবে ৬ষ্ঠ বর্ষ থেকে এবং তা অব্যাহত থাকবে ১০ম বর্ষ পর্যন্ত। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ১১শ থেকে শুরু হয়ে ২৫শ বর্ষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

খসড়া পরিকল্পনায় দেশের ৮টি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের জন্য সাধারণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ এবং অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ বিশেষ বিবেচ্য বিষয়সমূহ পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়। বিবেচ্য বিষয়সমূহ আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত, পানির সরবরাহ, চাহিদা পরিস্থিতি এবং কারিগরি অবস্থার সামগ্রিক কাঠামোর আলোকে বিবেচনা করা হয়। জাতীয় এবং আঞ্চলিক কার্যক্রম ৮টি প্রধান গুচ্ছ কার্যক্রমে ভাগ করে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ৮টি প্রধান গুচ্ছ কার্যক্রমের অধীনে সমগ্র দেশের ও আটটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের জন্য মোট ৮৪টি কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে যা স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বায়ূ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ুদূষণ মোকাবেলার লক্ষ্যে দেশে বেশ কিছু আইন ও বিধি বলবৎ রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ূদূষণ রোধে বেশকয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বায়ূতে যানবাহনের লেড সৃষ্ট দূষণের সমূহ বিপদ সম্পর্কে উপযুক্ত সচেতনতার কারণে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে সরকার সমগ্র দেশে লেডমুক্ত গ্যাসোলিন সরবরাহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধনপূর্বক প্রয়োজনীয় বিধি সংযোজন করা হয়েছে যার আওতায় পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস চালিত যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, অক্সিডেশন ক্যাটালিষ্ট ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি, ২০০২ হতে ঢাকা মহানগরীতে ২০ বছরের অধিক পুরাতন বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি এবং ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ট্রাক, মিনিট্রাক, ট্যাংকলরী, ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার মটরযান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিএনজি চালিত ফোর স্ট্রোক থ্রি হুইলার যানবাহন প্রচলন করা হয়েছে এবং সকল প্রকার পেট্রোল চালিত যানবাহনে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের' আওতায় জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরে একটি সার্বক্ষণিক বায়ূমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্যারামিটারের সাহায্যে বায়ূতে অবস্থানকারী বিভিন্ন দূষক পরিমাপ করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ঢাকা শহরের বায়ূমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি সার্বক্ষণিক বায়ূমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য মহানগরীতে বেশ কিছু স্যাটেলাইট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন এলাকার স্থানিক বায়ূ দূষণ পরিমাপের জন্য দুটি মোবাইল এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণকে বায়ূদূষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। সংশোধিত নতুন মানমাত্রার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি বায়ূমানসূচক তৈরি করা হয়েছে।

ইট ভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ দূষণরোধকল্পে সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটার বিকল্প হিসেবে কমপ্রেস পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব ব্লক ইট প্রচলন উৎসাহিত করা হচ্ছে। সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটায় ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনি স্থাপন ইতোমধ্যেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রচলিত ইট ভাটার (১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনিযুক্ত) পাশাপাশি জিগজাগ পদ্ধতির চিমনি এবং Vertical Shaft Brick Klin পদ্ধতির চিমনির প্রচলন উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর আওতায় ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ (বিধিমালা) ২০০৪ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ

দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে মার্চ, ২০০২ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন পাহাড় বা টিলা নাগরিক প্রয়োজনে কর্তন কিংবা মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন/মোচন করতে পারবে না। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও সিলেটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে। পাহাড় কাটা বন্ধে এলাকাবাসীর সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবনতা কমে আসছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য কিনা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দূষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইতঃপূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর-এসোশিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার আশেপাশের নদীসমূহ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ঢাকা বাঁচাও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারিগুলো সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার মধ্যবর্তী হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা হবে। স্বল্প মূল্যে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উপায়ে শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নরসিংদী জেলার মাধবদীতে প্রদর্শনী প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে যা শিল্প মালিকদের আকৃষ্ট করেছে।

পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ

পলিথিন শপিং ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় রোধে গত ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে ঢাকা মহানগরী এলাকায় এবং ১ মার্চ ২০০২ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সব ধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সরকার কড়াকড়ি পর্যবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলেছে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এ শব্দ দূষণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থাকায় তা সময়োপযোগী করার জন্য প্রস্তাবিত শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিবিমালা ২০০৪-এর খসড়া প্রণয়ন করে এর ওপর সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ সর্বসাধারণের মতামত আহবান করা হয়েছে। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। আশা করা যায়, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালাটি অনুমোদিত হলে এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক শব্দ দূষণ বিশেষতঃ মাইক এবং উচ্চমাত্রার হর্ণ এর শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হবে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

রিওতে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনে স্বাক্ষর করে। বন নীতি ও পরিবেশ নীতিতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে, জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত একটি পৃথক নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের আওতায় কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল

আইনসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল- মাৎস্য সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা, সামুদ্রিক মাৎস্য অধ্যাদেশ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, বন আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ও বিধিমালা ইত্যাদি। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশনের বিভিন্ন বিধানের প্রতি জাতীয় অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত বাংলাদেশের জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (The Bangladesh National Biodiversity Strategy and Action Plan) বর্তমানে প্রণয়নাধীন অবস্থায় রয়েছে।

১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (১৯৭৪ সালে সংশোধনকৃত) অনুযায়ী জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়স্থল হিসেবে দেশে তিন শ্রেণীর সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেশের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-ট্যুরিজম, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ ৪৫ হাজার হেক্টর এলাকায় ১৬ টি সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু, কক্সবাজার, টেকনাফ সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর ও মারজাত বাওর-এ ৬টি এলাকাকে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA) হিসাবে ঘোষণা করেছে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টাংগোয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে। উপকূলীয় ও জলাভূমিস্থ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (GEF) এবং ইউএনডিপি এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 'কোষ্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন এবং হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সুন্দবনের অংশবিশেষ (পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ) এবং টাঙ্গুয়ার হাওর-কে রামসার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৭ সনের ৬ ডিসেম্বর ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান (Word Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ UNFCCC-এর আওতায় GEF-UNDP-এর অর্থায়নে Initial National Communication প্রস্তুত করে অক্টোবর ২০০২ সালে UNFCCC সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। Initial National Communication-এ Greenhouse Gas Inventory,Vulnerability and Adaptation, Mitigation and Climate Change Response Strategy অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর UNDP/GEF এর আর্থিক সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের Comprehensive Disaster Management Programme এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণের লক্ষ্যে একটি ক্লাইমেট সেল গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া Kyoto Protocol এর আওতায় Clean Development Mechanism (CDM) অনুসারে National CDM Committee এবং National CDM Board গঠন করা হয়েছে। সিডিএম-এর আওতায় উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীনহাইজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রীনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করার মাধ্যমে 'Certified Emission Reduction' নিজের খাতে জমা করতে পারে। এর ফলে উন্নত ও উন্নয়শীল দেশ উভয়ই উপকৃত হতে পারে। ইতোমধ্যে সিডিএম বোর্ড দু'টি পৃথক সিডিএম প্রকল্প অনুমোদন করেছে। আরো কয়েকটি প্রকল্প স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বিচেনাধীন রয়েছে।

২০০২ সালে ঢাকায় স্বল্পোন্নত ৪২টি দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে National Adaptation Programme of Action (NAPA) শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশের আলোকে UNDP-GEF এর আর্থিক সহায়তায় 'Formulation of the Bangladesh Programme of Action to Climate Change' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল-

- জলবায়ূ পরিবর্তন মোকাবিলা করার সক্ষমতা (Adaptive capacity) বৃদ্ধি;
- বর্তমান Vulnerability এবং তৃণমূল পর্যায়ে বিদ্যমান Coping Strategy সমূহকে বিবেচনায় এনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি স্থির করা;
- Action oriented কর্মসূচি প্রণয়ন-যা নীতিনির্ধারকগণের নিকট বোধগম্য হবে।

ওজোনস্তর রক্ষা

ওজোনস্তর রক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে এরোসল সেক্টর-এর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ওডিএস) Phase out করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশে ওডিএস-এর বাৎসরিক ব্যবহার প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রিফ্রিজারেশন সেক্টরে অহেতুক সিএফসি নির্গমণ রোধকল্পে রিকভারী ও রিসাইক্লিং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিসিং শপের মালিক ও টেকনিশিয়ানদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওডিএস এর আদমানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রেণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

হাসপাতাল/ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ

ঢাকা শহরে সরকারি/বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক এণ্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন একযোগে কাজ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শ/নির্দেশনা অনুসরণে ইতোমধ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বায়ো মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা আইন প্রণীত হতে যাচ্ছে। ক্লিনিক্যাল বর্জ্য পরিবেশ সম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনার জন্য 'ট্রেনিং অন এনভায়রনমেন্টালি সাউণ্ড ম্যানেজমেন্ট অব বায়োমেডিক্যাল ওয়েষ্ট ইন ঢাকা সিটি, বাংলাদেশ বাসেল কনভেনশন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম

সররকার ইউএনডিপির সহায়তায় 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিবেশ শিক্ষাক্রম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাক্রমে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করেছে। অধিকন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা ও শিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন কার্যক্রম বর্তমানে অব্যাহত আছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সরকারের মূল সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত সাইক্লোন, খরা, ঝড় ইত্যাদির পূর্বভাস, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূরাভাস সংস্থা (স্পারসো) আবহাওয়া সংক্রান্ত স্যাটেলাইট তথ্যাদি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশে বন্যা একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। সরকার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার ১৯৮৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার অব্যবহিত পরেই বিশ্বব্যাংক এর সহায়তায় বন্য কর্মপরিকল্পনা (Flood Action Plan-FAP) গ্রহণ করে। এছাড়া, সরকার নিজস্ব এবং বৈদেশিক অর্থায়নে দুই হাজারেরও বেশী সাইক্লোন ও বন্যাকালীন আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছে। উপকুলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসের প্রকোপ হ্রাসের জন্য উপকূলীয় এলাকায় সবুজবেষ্টনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সাইক্লোন প্রস্তুতি কর্মসূচি (Cyclone Preparedness Programme-CPP) পরিচালনা করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনটি জাতীয় কমিটি কাজ করছে। কমিটিসমূহ হ'ল- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল'। এ কাউন্সিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রয়েছে ৩০ সদস্যের 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি'। এ উপদেষ্টা কমিটি দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং কারিগরি ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল', দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নীতি ও সিদ্ধান্ত বস্তবায়ন, দুর্যোগ প্রতিরোধ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃতাধীন 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি'।

ইন্ট্রিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্লান (আইসিজেডএমপি)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ দ্বার প্রভাবিত। এ অঞ্চলের জনগণের জন্য প্রয়োজন যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, বন্যা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অনুকুল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি। এ প্রেক্ষিতে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার, নেদারল্যান্ডস ও ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক অনুদানে ইন্ট্রিগ্রেটেড কোষ্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (আইসিজেডএমপি) প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ ২০০২-২০০৫ সালের মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

- উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন;
- অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রণয়ন এবং
- অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যেসমূহ হলঃ

- উপকুলীয় অঞ্চলের সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনা;
- অনাবিষ্কৃত ও অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহারের উদ্যোগ;
- পরিবর্তিত জলবায়ূর সাথে সহনশীল ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং
- পরিবশেগত সম্পদের অবক্ষয় হ্রাস।

প্রকল্পের সমূহ উদ্দেশ্যগুলো হল-সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে উন্নত ব্যবস্থাপনা; উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং মানব কর্মকান্ডের দরুন প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ রোধ; বিভিন্ন প্রজাতি বিলুপ্তিকরণ (সামুদ্রিক এবং স্থল) এবং পরিবশেগত দূষণ হ্রাসকরণ।

পরিবেশ সংরক্ষণে এনজিও কার্যক্রম

দেশের পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা এবং পরিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নে আশির'র দশক থেকে সরকারের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সংগঠিত করার ব্যাপারে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন), সেন্টর ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিএসিএস), এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার, ওয়েস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি ইত্যাদি।

পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে কতিপয় নীতি ও আইন

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নসহ পরিবেশ সংরক্ষণে অন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা দরকার। এ জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা সৃষ্টি ও আইনগত বাধ্যবাধকতা। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতি ও আইন-কানুন তৈরী করা হয়ঃ

পরিবেশ নীতি, ১৯৯২: দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯২ সালে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ প্রণয়ন করে। এ নীতিমালার অধীনে কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসহ মোট ১৫টি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫: দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হওয়ায় সরকার ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ প্রণয়ন করে। পরবর্তীকালে পরিবেশ আইনের বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়নসহ পরিবেশ দূষণকারীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ এবং বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবেশ আদালত স্থাপন করার লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ৬ এপ্রিল ২০০০ তারিখে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন ২০০০ বিলটি পাশ হয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭: পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়।

পরিবেশ আদালত আইন ২০০০: দেশব্যাপী পরিবেশদূষণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তিকল্পে প্রণীত 'পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। এই আইনের আওতায় প্রত্যেক বিভাগে একটি করে পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে । এছাড়া একজন বিচারকের সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা এবং চট্রগ্রামে ২ টি পরিবেশ আদালত গঠিত হয়েছে এবং ঢাকায় একটি পরিবেশ আপীল আদালত গঠন করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তর

দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষায় বন অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই ব্যপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এছাড়া বন বিদ্যার প্রযুক্তিগত দিকের উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির উন্নয়ন, সংরক্ষণ, বিশেষকরে ঔষধি গাছের সংরক্ষণ এবং বৃক্ষরোপন অভিযানে জনগনের ব্যাপক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসুচী অব্যাহত রয়েছে।

দেশের বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ বৎসর ব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০ বছর মেয়াদি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১. অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ।

২. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে ট্রি ফার্মিং ফান্ড (Tree Farming Fund) গঠন।

৩. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) প্রণয়ন। এতে সামাজিক বনায়নের আইনগত ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে।

৪. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ। যেমনঃ ক. মধুপুর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, টাঙ্গাইল; খ. মাধবকুন্ড-মুরাইছড়া জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন প্রকল্প, গ. কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, ঘ. দুলাহাজরা সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ/জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

এছাড়া বন বিভাগের মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা, সাফারী পার্ক উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সরাসরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বন বিভাগ কর্তৃক ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৯৮ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ)

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ) উদ্ভিদ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি জাতীয় উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা। দেশের ঐতিহ্যবাহী গাছপালাসহ যাবতীয় বৃক্ষলতা প্রজাতির সনাক্তকরণ ও এদের নমুনা সংরক্ষণ করা ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। দেশের ভেষজ সম্পদ, উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষসম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র সংরক্ষণে হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কার্যক্রম কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

- **উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমঃ** রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও সিলেট জেলার বিভিন্ন এলাকায় জুন ২০০৪ হতে অদ্যাবধি উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রায় ১৫০০ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- **উদ্ভিদ সনাক্তকরণঃ** Taxonomic studies-এর মাধ্যমে প্রায় ৫০০ উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আনুমানিক আরো ৩০০ প্রজাতির উদ্ভিদ সনাক্ত করেছে।
- **Taxonomic studies ও Flora of Bangladesh প্রকাশনা কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে সম্পাদিত Taxonomic studies এর মাধ্যমে Flora of Bangladesh সিরিজ প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় সাতটি Angiospermaic Family এর পান্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা হবে।
- **ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনাঃ** ন্যাশনাল হারবেরিয়াম জুন ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি ২০টি ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনা বিভিন্ন জার্ণালে প্রকাশ করেছে।

- **ভেষজ উদ্ভিদ ম্যানুয়েল প্রকাশনাঃ** ন্যাশনাল হারবেরিয়াম বাংলাদেশের ভেষজ উদ্ভিদের ওপর একটি সচিত্র ম্যানুয়েল প্রকাশনার তৃতীয় খণ্ডের কাজ করে যাচ্ছে।
- **পার্বত্য আঞ্চলের ঔষধি উদ্ভিদের প্রকাশনাঃ** ন্যাশনাল হারবেরিয়াম পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলের উপজাতীয় লোকজনের ব্যবহৃত ঔষধি উদ্ভিদের সচিত্র বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।
- **Flora of Bangladesh-এর জন্য পাণ্ডুলিপি রচনাঃ** Flora of Bangladesh প্রকাশের উদ্দেশ্যে ৫টি Angiospermaic Family এর পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শুরু করা হয়েছে।
- **Flora of Sundarban প্রকাশনাঃ** সুন্দরবনের উদ্ভিদ বৈচিত্র প্রকাশের লক্ষ্যে Flora of Sundarban প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **Hand Book on Flora of Bangladesh প্রকাশনাঃ** বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত একটি Hand Book on Flora of Bangladesh প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকার সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৩২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৬৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা হল ২৫ টি এবং এজন্য এডিপি বরাদ্দ ১৪৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। এছাড়া চলতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭ টি কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সরাসরি দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এসকল প্রকল্প বা কার্যক্রম ছাড়াও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়া যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এর পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়টি প্রকল্প সারপত্রে উল্লেখ করার বিধান করা হয়েছে।